The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 57-66, ISSN 2306-3920

সক্রেটিস'র উত্তম জীবন-এর ধারণা

আরিফা সুলতানা*

[**সার-সংক্ষেপ:** নৈতিক আলোচনা মানববিদ্যার আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দর্শনের অন্তর্গত নীতিবিদ্যা নামক জ্ঞানের শাখায় এ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়। যে কোন নৈতিক আলোচনার প্রধান লক্ষ্য হলো উত্তম জীবনের দিক-নির্দেশনা দেওয়া। প্রাচ্য দর্শনের শুরুতেই এই নৈতিক আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। তবে পাশ্চাত্য দর্শনের যাত্রা মূলত বিশ্বতাত্ত্বিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়। এক পর্যায়ে সেখানে দর্শনের অন্যান্য সমস্যার মতো নৈতিক সমস্যাও গুরুত্ব পেতে থাকে। তবে সক্রেটিসের সময় থেকে এই আলোচনা গুরুত্ব পেতে শুরু করে। তাই পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার আলোচনায় সক্রেটিসের নৈতিক মতবাদ ঐতিহাসিকভাবেই খুব গুরুত্ব বহন করে। নীতিবিদ্যার মূল শিক্ষা উত্তম জীবনের দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে তিনি যে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে সক্রেটিসীয় নৈতিক শিক্ষা বা উত্তম জীবনের নির্দেশনা কীভাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে– এ প্রবন্ধে সেই বিষয়টিও সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে এখানে মূলত বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক ও অবরোহমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।]

উত্তম জীবনযাপন করা একটি নৈতিক বিষয়। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণি। এই বিষয়টি নৈতিকতার জন্য এবং উত্তম জীবনের জন্য এক ধরনের ভিত্তি প্রদান করে। বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা হিসেবে মানুষের স্বাভাবিকভাবেই উত্তম জীবন যাপন করা উচিত। এটা বলা হয়তো অসঙ্গত নয় যে, প্রত্যেক মানুষ উত্তম জীবন যাপন করতে চায়। বাস্তবিক জীবনে লোকেরা বলে এটা সুন্দর, ওটা সুন্দর কিন্তু তারা অনেকেই জানেন না, সৌন্দর্য বলতে কী বোঝায়। যিনি ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের ওপর সারাজীবন রায় দিয়ে এসেছেন অথচ ন্যায় সম্পর্কে, ভালো সম্পর্কে তাঁর আদৌ কোনো পরিস্কার ধারণা নেই। কোন ব্যক্তি উত্তম বা আদর্শ জীবন কাটাচ্ছেন বলে হয়তো অহমিকা প্রকাশ করে এসেছেন, কিন্তু জীবনের উত্তম সম্পর্কে হয়তো তার কোনো ধারণাই নেই। যদিও উত্তম জীবন কাকে বলে তা নিয়ে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কী হলে বা কী করলে জীবন সবচেয়ে উত্তম বা ভালো হবে এ বিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেমন পার্থক্য আছে তেমনি একই ব্যক্তির কাছে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কোন্ ধরণের মানদণ্ডের আলোকে জীবনযাপন করলে জীবন উত্তম হবে সে বিষয়ে নীতিবীদদের মধ্যেও যে ঐক্যমত আছে তা নয়। সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রি.) প্রথম মানুষের কাজ সম্পর্কে বলেন, মানুষ "যেভাবে কাজ করে" ও মানুষের "যেভাবে কাজ করা উচিত" এ দুটো বিষয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।[১] সক্রেটিস মনে করেন, ঔচিত্যের প্রশ্নে সত্য, সুন্দর, শুভ ও ন্যায় এগুলো হবে

---

* **আরিফা সুলতানা :** সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

১. জর্জিয়াস সংলাপে সক্রেটিস "হয়" এবং "উচিত" বাক্যের মধ্যে পার্থক্য করেন। পরবর্তীকালে আধুনিক দর্শনে ডেভিড হিউম এবং সমকালীন দর্শনে জর্জ এডওয়ার্ড মূর "হয়" এবং "উচিত" বাক্যের এ জাতীয় বিভাজন করেছেন। যা পরানীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত করে।

এমন যা সবার জন্য একইরকম। কিন্তু সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিক প্রোটাগোরাস (৪৮১-৪১১ খ্রি.) জর্জিয়াস (৪৮৩-৩৭৫ খ্রি.), হিপ্পিয়াস, প্রডিকাস প্রমুখ সোফিস্টদের সাথে এক্ষেত্রে তাঁর ধ্যান-ধারণার পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তাঁরা ভালো-মন্দ, সত্য, ন্যায়-নৈতিকতার সার্বিক দিকটিকে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সক্রেটিস ভালো-মন্দ, ন্যায়- অন্যায়, জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ ও সর্বজনীন মানদণ্ড আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নিজেকে জানা, নিজের সম্পর্কে জানা এবং নিজের জীবনে চলার দিক-নির্দেশনা অন্বেষণ করাই ছিল তাঁর দার্শনিক অনুসন্ধান। সক্রেটিস ছিলেন একজন আদর্শ দার্শনিক যিনি মানবজীবনের এক মহান মতবাদ দ্বারা তাঁর ভক্তদের অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম ছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী উত্তমজীবন কী হতে পারে? এর সাধনা করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধ সক্রেটিসের উত্তমজীবনের স্বরূপ অন্বেষণের প্রয়াস।

তৎকালীন দ্বন্দ্বমুখর রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি সক্রেটিস বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার অন্যায় ও অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে তিনি নিষ্ঠা ও সততার সাথে সংগ্রাম করতে পেরেছিলেন কেননা তাঁর মাঝে ছিল তীক্ষ্ণ ন্যায়বোধ। সমাজব্যবস্থার এ ধরণের পরিস্থিতিতে অনুধ্যানী চিন্তাচেতনার চেয়ে প্রায়োগিক চিন্তা-চেতনা তাঁর মাঝে মুখ্য হতে দেখা যায়। তাই তিনি উত্তম জীবনের জন্য নাগরিকদের মাঝে জ্ঞানের স্পৃহা জাগ্রত করতে চাইলেন। সেক্ষেত্রে তিনি জ্ঞান অর্থাৎ কোন কিছুকে জানার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কেননা তিনি বঝুতে পেরেছিলেন জ্ঞান সমাজকে প্রগতির দিকে নিয়ে যায়। অজ্ঞতা সমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়, পশ্চাদমুখী করে তোলে। সক্রেটিস বুঝতে পেরেছিলেন মানুষের অগ্রসরমান প্রগতিশীল জীবনের জন্য জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই।

সক্রেটিসের জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধানের মূলে ছিল এক বাস্তব নৈতিক প্রেরণা। সক্রেটিসের চিন্তার এক বড় অংশ ছিল ঈশ্বর। তিনি মনে করেন, জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার কারণ হিসেবে এক বুদ্ধিমান সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেই সত্তা হচ্ছে ঈশ্বর। ঈশ্বর বলতে তিনি বুঝেছেন, এক সর্বব্যাপক, পরিণামদর্শী আধ্যাত্মিক সত্তাকে, কোনো জড়ীয় সত্তাকে নয়।

তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, ঐশ্বরিক শক্তি তাঁকে সবসময় পরিচালিত করছে। প্লেটোর '*এ্যাপোলজি*' (*The Apology*) - গ্রন্থে 'ঈশ্বরের প্রতি সক্রেটিসের প্রগাঢ় বিশ্বাসের কথা চমৎকারভাবে বর্ণিত ও বিধৃত হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি বলেন, 'ঈশ্বর দ্বারাই তিনি পরিচালিত হবেন, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা নয়।' (আমিনুল, ১৯৭৮: ৯৬-৯৭) সক্রেটিস তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী নিজেকে জানা, নিজের সম্পর্কে জানা এবং নিজের জীবনকে সৎ ও শুভ উদ্দেশ্যে চলার দিক-নির্দেশনা প্রদানে নিয়োজিত রেখেছেন। সক্রেটিস বলেন, 'নিজেকে জানো'– নিজেকে চিনতে পারলেই স্রষ্টাকে চেনা যায়। আর যিনি স্রষ্টাকে চিনতে পেরেছেন তিনি অন্যায় বা অনৈতিক পথে চলতে পারেন না, খারাপ কাজ করতে পারে না, অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার করে মানবসমাজকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে না। (শাহনাওয়াজ, ১৯৯৬: ১৯২-১৯৩)

সক্রেটিসের দার্শনিক মত সম্পর্কে কোনো তথ্যাদি আমাদের কাছে নেই কেননা, সক্রেটিস নিজে কোনো গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন না। বিভিন্ন লেখক যেমন– যেলার, বার্নেট, মার্কিনটাইয়ার, গুথরি প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে সক্রেটিসকে জ্ঞানের সূতিকাগার অথবা দর্শনের সূতিকাগার (MacIntyre, 1966: 21) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানতে পারি তা হলো তাঁর প্রিয় শিষ্য প্লেটো ও জেনোফোনের লেখনী হতে। প্লেটোর প্রথম দিকের লেখা *এ্যাপলজি*, *ইউথিফ্রো*, *ল্যাচেস*, *ক্রিটো*, *মেনো*, *প্রোটাগোরাস* এবং *জর্জিয়াস।* প্লেটোর সংলাপ ছাড়াও জেনোফোনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে *এ্যাপোলজি* ও *মেমোরাবিলিয়া*। তাঁদের গ্রন্থসমূহ সংলাপাকারে রচিত। তাঁদের সংলাপের কেন্দ্রিয় চরিত্র সক্রেটিস। তাঁদের নিজস্ব মতামত সক্রেটিস চরিত্রের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে। এতে করে "সক্রেটিস" চরিত্রের মাধ্যমে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা সক্রেটিসের মতামত নাকি প্লেটোর মতামত–? এই সমস্যাটি গ্রিক দর্শনের ইতিহাসে "সক্রেটিসীয়" সমস্যা নামে চিহ্নিত

করা হয়েছে। সম্প্রতি অবশ্য এ মতটিকে চ্যালেঞ্জ করে বলা হয়েছে যে, প্লেটো প্রথমদিকে একজন বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালন করেছেন এবং 'ফিডো', 'সিম্পোজিয়াম', 'রিপাবলিক' প্রভৃতি প্রথম দিকের সংলাপে তিনি সক্রেটিসের মুখ দিয়ে যেসব কথা বলিয়েছেন সেসব সক্রেটিসেরই দার্শনিক মতের ভাষ্য, প্লেটোর নিজের মত নয়। (আমিনুল, ১৯৭৮: ৯৩) বর্তমান প্রবন্ধে প্লেটোর ঐ সকল সংলাপের উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে, এবং তার মধ্যে থেকে সক্রেটিসের মত বের করে আনার চেষ্টা করা হবে। মেমোরাবিলিয়া গ্রন্থের বক্তব্য প্লেটোর রচিত প্রোটাগোরাসের বক্তব্যের সদৃশ। এই গ্রন্থে আমরা সক্রেটিসের নীতিদর্শন তথা উত্তমজীবন সম্বন্ধে জানতে পারি। প্লেটো ও জেনোফোনের সংলাপ এবং দর্শনের ইতিহাসের উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য রসদ সংগ্রহ করা হয়েছে।

সক্রেটিস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, নির্বিচার বিশ্বাস ও কুসংস্কারের হাত হতে অব্যহতি পাওয়ার উপায় হচ্ছে জ্ঞান। (আমিনুল, ১৯৭৮: ৯৪) তাঁর মতে, জ্ঞান হলো এক ধরনের 'সার্বিক ধারণা'। সার্বিক ধারণা বলতে তিনি এমন এক ধরনের ধারণাকে বুঝিয়েছেন যা কোন শ্রেণী বা জাতির সকল সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ গুণের জ্ঞানকে বোঝান। (Stace,1965:146) তিনি আরও মনে করেন, সব মানুষের বেলায় প্রযোজ্য এবং সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য জ্ঞানই যথার্থ ও সার্থক জ্ঞান। অর্থাৎ সার্থক জ্ঞান মানেই সর্বজনীন জ্ঞান। (আমিনুল, ১৯৭৮: ৯৫) আমাদের মাঝে সর্বজনীন জ্ঞানের বিকাশ ঘটালেই আমরা নৈতিকতা কী জানতে পারব। নৈতিক হওয়ার অর্থ বুঝতে সক্ষম হবো। তাই সক্রেটিস বিশ্বজগতের নিগূঢ় রহস্য নিয়ে আলোচনার চেয়ে জীবন ও সমাজের বাস্তব বিষয়াদি নিয়ে আলোচনাতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। যেমন– মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? মানুষের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কিসে নিহিত– এ জাতীয় জীবনধর্মী প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানই ছিল তাঁর চিন্তার অগ্রাধিকার। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মঙ্গল- অমঙ্গল, ন্যায়-অন্যায়, মিথ্যাচার, সাহস, ধার্মিকতা ইত্যাদি শব্দের অর্থ কী হতে পারে তা বিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগী হন। সক্রেটিস তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী জ্ঞান কী, উত্তম জীবন কী? উত্তম জীবনের জন্য করণীয় কী এ সম্বন্ধে বিশ্লেষণমুখী দর্শন চর্চা করে গেছেন। (আমিনুল, ১৯৭৮: ৯৩)

সক্রেটিস তাঁর দর্শনে নীতিতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্বকে এক করে দেখেছেন। কেননা তাঁর নীতিতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্বের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। সক্রেটিস গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, জ্ঞান মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জ্ঞানের আলো মানুষের অন্তরকে পূর্ণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে। একমাত্র জ্ঞানের মধ্য দিয়েই মানুষ সত্যকে চিনতে পারে। যখন তার কাছে সত্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে ওঠে, সে আর কোনো পাপ কাজ করে না। অজ্ঞানতা থেকে পাপের জন্ম। জ্ঞানই মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে মঙ্গল, কল্যাণ ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। আর মানুষ মাত্রই মঙ্গল, কল্যাণ, ন্যায়পরতা, মিতাচার, ধার্মিকতা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি মানবিক গুণগুলো আহরণ করতে চায়। তিনি তাই মানুষের মনের অজ্ঞানতাকে দূর করে তার বিচারবুদ্ধি বোধকে জাগ্রত করতে চাইলেন। জ্ঞানের জন্য স্থায়ী বস্তুর সন্ধান করতে যেয়ে সক্রেটিস মনে করেন, চিন্তন প্রক্রিয়ায় বস্তুর স্থায়ী ধারণাকে আবিষ্কার করা যায়। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা আমাদের জ্ঞানের স্থায়ী সার্বিক ধারণা দিতে পারে। সার্বভৌম সার্বিক বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা যথার্থ জ্ঞানের উৎস। প্রজ্ঞাই মানুষের ধর্ম, মনুষ্যত্বের বিশেষ লক্ষণ। প্রজ্ঞার কল্যাণেই মানুষ ইতর প্রাণীর চেয়ে স্বতন্ত্র ও উচ্চতর। প্রজ্ঞার সাহায্যেই জ্ঞানের প্রামাণ্য ও যথার্থতা যাচাই করতে হবে। কেননা প্রজ্ঞা সব মানুষেরই সমান। প্রজ্ঞার আলোকে যাকে সত্য বলে প্রতীত হয়, তাই যথার্থ সত্য। জ্ঞানের উৎস হিসেবে তিনি বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার গুরুত্বের কথা স্বীকার করেন। কেননা বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে আমরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের বাইরে বস্তুজগতের যে শাশ্বত রূপ আছে তা জানতে পারি। প্রজ্ঞাভিত্তিক জ্ঞান সবার জন্য গ্রহণযোগ্য সার্বিক ও সর্বজনীন জ্ঞান। (আমিনুল, ১৯৭৮: ৯৫) তিনি এভাবে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা নির্ভর জ্ঞানের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন।

সক্রেটিস মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আগ্রহ সৃষ্টি করতে চাইলেন। মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আগ্রহ সৃষ্টি করতে তিনি একটি কৌশল প্রয়োগ করলেন– আর সেটি হলো দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। সক্রেটিসের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হলো, কোনো একটি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন-উত্তরের আকারে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা। এ পদ্ধতিতে প্রথমে প্রতিপক্ষের মত স্বীকার করা হয়। কিন্তু পরে যৌক্তিক উপায়ে একে খণ্ডন করা হয়। (আমিনুল, ১৯৭৮: ৯০) অর্থাৎ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যকে জানা। সক্রেটিসের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তৎকালীন সময়ে প্রচলিত মতের মাঝে যেসব পরস্পর বিরোধী মত ছিল সেগুলোকে উন্মোচন করার একটা প্রক্রিয়া। এছাড়া এই পদ্ধতির আরেকটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, বিরোধী পক্ষের জন্য তিনি তর্কের ফাঁদ পাততেন এবং পরাজিত হয়ে যতক্ষণ না প্রতিদ্বন্দ্বী নিজের ভুল স্বীকার করে, ততক্ষণ তাকে প্রশ্ন করতেন। অনবরত প্রশ্ন করে সংলাপে অংশগ্রহণকারীর মন থেকে ভুল ধারণা দূর করে তার মুখ থেকেই তিনি সত্য বের করতেন। (আমিনুল, ১৯৭৮: ৯০) দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রিটো সংলাপে সক্রেটিসকে নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করতে দেখা যায়। তিনি বলছেন–

> "জ্ঞানীর অভিমতই ন্যায্য এবং মঙ্গলকর; মূর্খের অভিমত অন্যায্য এবং অমঙ্গলকর। ... আমাদের বিষয় হচ্ছে : ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, সঙ্গতি অসঙ্গতির বিষয়, এসব ক্ষেত্রে আমরা কি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই ভয় করব, মান্য করব ? অথবা যে একজন মাত্র ব্যক্তির এ সম্পর্কে জ্ঞান আছে তার মতকেই স্বীকার করব? এই জ্ঞানীর অভিমতকেই প্রয়োজনবোধে সমগ্র জগতের বিরুদ্ধেও আমাদের সম্মান করা এবং ভয় করা উচিত নয় কি? তা না করে যদি আমরা সেই জ্ঞানীকেই পরিত্যাগ করি, তাহলে কী তা দ্বারা আমরা আমাদের সেই নীতিকেই আঘাত করে ধ্বংস করি না, যে নীতি ন্যায়ের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এবং উন্নীত হয়ে উঠে এবং অন্যায়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়? ... আমাদের নিকট মূল্যবান হচ্ছে ন্যায় এবং অন্যায়কে যিনি জানেন তিনি কি বলেন। আমাদের নিকট মূল্যবান হচ্ছে সত্য কি বলে। ... ব্যক্তির পক্ষে কি করা সঙ্গত? যাকে সে সত্য বলে জানে সে কি সেই সত্যকে রক্ষা করবে, সেই সত্যকে পালন করবে, না সে সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে? (Jowett, 1965: 53-57)

সক্রেটিসের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হলো দ্বিধাহীনভাবে নিজের অজ্ঞানতা স্বীকার করে যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের তলোয়ার খেলায় শ্রোতাদের মাঝ থেকে সে সম্পর্কে উত্তর আহ্বান করা। প্রাপ্ত উত্তরের ভিত্তিতে পুনরায় প্রশ্ন করা এবং এক পর্যায়ে উত্তরকারীরা নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের যে দাবি করছেন সে দাবিকে অসার প্রমাণিত করা। (আজিজুল, ২০০২: ৩৪-৩৫) এতে করে সক্রেটিসের উদ্দেশ্য প্রচলিত মতের মাঝে পরস্পর বিরোধিতা ও অযৌক্তিতাকে শ্রোতাদের সম্মুখে উন্মোচিত করা এবং সে বিষয় সম্বন্ধে তাদেরকে যৌক্তিক জ্ঞান প্রদান করা। (আনোয়ারুল্লাহ, ২০০৩: ৮৯) আর তাঁর মতে সার্বিক জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। এসব বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তিনি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে দাঁড় করবার চেষ্টা করেছেন।

সক্রেটিস এভাবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন শব্দ বা প্রত্যয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে সচেষ্ট ছিলেন। সক্রেটিসের জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় সংজ্ঞা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি মনে করেন, সংজ্ঞার মাধ্যমে সার্বিক জ্ঞান পাওয়া যায়। সার্বিক জ্ঞান বলতে তিনি কোনো বস্তুর মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কীয় জ্ঞানকে নির্দেশ করেন। মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুর এমন কিছু গুণ যেগুলো একই শ্রেণির বস্তুর মাঝে সমানভাবে উপস্থিত থাকে যেমন– সকল মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা আছে। এটা মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা সকল মানুষের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দার্শনিক, সবাই নয়। এখানে দার্শনিক এই গুণটি মানুষ জাতির সকল মানুষের ক্ষেত্রে উপস্থিত নেই। তাই এটি মানুষের কোন অপরিহার্য বা মৌলিক গুণকে নির্দেশ করে না। আবার দার্শনিক এই গুণটি তাকে মানুষ জাতির অন্যান্য মানুষ থেকে আলাদা করেছে। তাই

সক্রেটিসের ধারণা ছিল যে কোনো বস্তু সম্বন্ধে সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গেলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে ঐ বস্তুর এমন গুণ যা অন্যান্য বস্তু থেকে এটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। (ফজলুল, ১৯৬৫: ২৮৩-২৮৪) সক্রেটিস তাই যে কোনো শব্দের সংজ্ঞা নির্ধারণে স্বতন্ত্রতা প্রদানকারী গুণ ও সার্বিক গুণকে গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য গুণাবলীকে সংজ্ঞার ধারণা থেকে বর্জন করেন। এভাবে সক্রেটিস দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ভালো, মঙ্গল, সাহস, ন্যায়পরতা, ধার্মিকতা ইত্যাদি শব্দের সঠিক সংজ্ঞাকে নির্দেশ করেন। সক্রেটিস মনে করেন সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমাদের সার্বিক ধারণা গঠন করতে হবে।

সক্রেটিসের জ্ঞানতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আরোহ পদ্ধতি। বুদ্ধিনির্ভর জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে তিনি আরোহকে বিবেচনা করেছেন। এই পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে সার্বিক সিদ্ধান্ত উপনীত হয়। যেমন, নৈতিক সম্প্রত্যয় ‘ন্যায়পরায়ণতা’- এর সম্পর্কে ধারণা তৈরি করার জন্য বিশেষ বিশেষ ন্যায়পরতাকে পর্যবেক্ষণ করে আমরা সার্বজনীন ধারণায় উপনীত হই। (আনোয়ারুল্লাহ, ২০০৩: ৮৯) তাই এ পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানের বৈধতা বিচার করা হয়। সক্রেটিস বাস্তব জীবনের দিকগুলো প্রতিটি পদক্ষেপে যাচাই করেছেন বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকে, বাস্তব অবস্থা থেকে। তিনি প্রতিপক্ষকে প্রশ্ন করতেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা এবং সেসব মতামত যৌক্তিক উপায়ে খণ্ডন করতেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে এ কৌশল থেকে প্রতিপক্ষের মন থেকে ভুল ধারণা দূর করে নিজস্ব মত ব্যাখ্যা করতেন। এভাবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ বিশেষ দৃষ্টান্ত বা মতকে যাচাই করে সার্বিক নিয়মকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতেন। জ্ঞানের বিষয়ের নিশ্চয়তা প্রদান ও সার্বিকীকরণের জন্য আরোহ পদ্ধতির গুরুত্ব রয়েছে।

সক্রেটিসের নীতিদর্শনের মূল কথা হলো ‘জ্ঞানই সদগুণ’। তাঁর সদগুণ তত্ত্ব বলে যে, সমস্ত গুণাবলী মূলত এক, যেহেতু তারা জ্ঞানের একটি রূপ। তিনি জ্ঞান ও নৈতিকতাকে অভিন্ন মনে করেছেন। তাঁর নৈতিক দর্শনে বুদ্ধি বা এর দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় মূলত একটি উত্তম জীবন যাপনের উপায় হিসাবে। তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে আমরা দেখেছি যে, তিনি জ্ঞান বলতে, যথার্থ সত্যজ্ঞানকে বুঝিয়েছেন যা সর্বজনীনভাবে সত্য। ভালো বা পুণ্য বলতেও তিনি বোঝান এমন কিছুকে যা সকলের জন্য অর্থাৎ সর্বজনীনভাবে ভালো বা পুণ্য। (শওকত, ২০১২: ১২৩) তাঁর নীতিদর্শন ছিল প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক নীতিদর্শন। কারণ দৈনন্দিন জীবনের মানবীয় সঙ্কট, মানুষের প্রয়োজন, চাওয়া-পাওয়াগুলোর আলোকে তিনি নীতিদর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, ব্যবহারিক জীবনে যে নৈতিক স্বচ্ছতা, আদর্শ, স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম, বিশুদ্ধতা ও বৈধতা রয়েছে– তা দিয়ে নৈতিকতা বা নৈতিক জীবন ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, বরং ব্যবহারিক জীবনের কাজ, কাজের প্রকৃতি এবং কাজের ফলাফল দিয়ে তিনি নৈতিকতাকে যাচাই করতে চেয়েছেন। (আনোয়ারুল্লাহ, ২০০৩: ৮৮) তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রায়োগিক নীতিবিদ্যায় উত্তমজীবনের স্বচ্ছতা, বৈধতা ও শুদ্ধতা যাচাই করা হয় কাজ দিয়ে, কাজের প্রকৃতি ও ফলাফল দিয়ে। সক্রেটিস মনে করেন কর্মের একটি আদর্শ হিসেবে আমাদের ভালো-মন্দ, ন্যায় সম্পর্কে জানতে হবে। তাই তিনি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত সত্য ও মঙ্গলের আত্মগত মানদণ্ডের বদলে প্রদান করতে চেয়েছিলেন এক সর্বজনীন নৈতিক আদর্শ। কিন্তু প্রোটাগোরাস, হিপ্পিয়াস, জর্জিয়াস প্রমুখ সফিস্ট দার্শনিকরা নৈতিকতার সঠিক দিকটিকে অস্বীকার করেছিলেন। তারা ভালো যুক্তিবাদী বা তার্কিক হওয়ার জন্য জ্ঞানের আলোচনা করতেন। কিন্তু সক্রেটিস উত্তম জীবনযাপনের গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যকারী হিসেবে জ্ঞানের আলোচনা করেছিলেন। তিনি মনে করেন, যথার্থ জ্ঞান মানুষকে প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবে। মেমোরাবিলিয়াতে তিনি বলেন, সত্য, সুন্দর ও শুভময় জীবন প্রতিটি মানুষের কাম্য। জ্ঞানই মানুষকে এমন জীবন দিতে পারে। অজ্ঞানতা দিতে পারে না। (Lindsay,1954: 121-123) সক্রেটিস মনে করেন, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময় জীবনের সাথে প্রজ্ঞা, ধার্মিকতা, সাহস, ন্যায়পরতা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। কেননা মানুষ যখন জ্ঞানের চর্চা করবে, তখন

মানুষের চরিত্রে ধার্মিকতা, সাহস, ন্যায়পরতা এসব নৈতিক গুণ হিসাবে বিরাজ করবে। ধার্মিকতা, ন্যায়পরতা সাহস কেবল উচ্চারিত শব্দ নয়। এগুলোর অর্থ জ্ঞানের গভীরে নিহিত। তিনি মনে করেন, এগুলোর অর্থ স্পষ্ট করতে সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে হবে। কেননা এগুলো সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান না থাকলে এগুলোকে আমরা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারবো না। এগুলোর অনুশীলন হবে ত্রুটিপূর্ণ। তাই শব্দের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সার্বিক, স্থায়ী ও মৌলিক অপরিহার্য গুণ বা বৈশিষ্ট্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন। যেমন, 'সততার' সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে এর উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ তাতে প্রকাশিত হচ্ছে কিনা। যেমন, 'শুভ' নিয়ে তিনি যখন অলোচনা করতেন তখন এর মধ্যকার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় রেখে, অন্যান্য ক্রিয়াকান্ডে শুভ কিভাবে সংঘটিত হচ্ছে তার সাধারণীকরণ করে এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতেন। (আনোয়ারুল্লাহ, ২০০৩: ৮৯) তিনি এও মনে করেন সংজ্ঞায়নের জন্য নৈতিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব ধারণা রয়েছে সেগুলোর সম্বন্ধে সকলের ধারণার ঐক্য না থাকলে বিষয়টি আপেক্ষিক হয়ে পড়বে। যেমনঃ আমরা যদি বলি শিশু শ্রম অন্যায় অথবা যদি বলি শিশু পাচার করা উচিত নয়। এখানে কতগুলো কাজের প্রসঙ্গে অন্যায় বা অনুচিত বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে আমাদের প্রাক-ধারণা থাকতে হবে। প্রাক-ধারণা নৈতিকতার সার্বিক রূপ দিতে সাহায্য করে। তাই সক্রেটিস মনে করেন, নৈতিক আচরণ করার গুরুত্বপূর্ণ প্রারম্ভিক বিষয় হচ্ছে নৈতিক ধারণাসমূহের অর্থ সম্বন্ধে ঐক্যমত পোষণ করা। (Guthrie, 1969: 165) সেজন্য সংজ্ঞার ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্য সক্রেটিস দ্বান্দ্বিক ও আরোহ পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

নৈতিকতা সম্বন্ধীয় আলোচনায় সক্রেটিস মনে করেন, ন্যায়নিষ্ঠ ও শুভ জীবনযাপনের জন্য ন্যায় ও শুভ কী তা আগে জানতে হবে। একজন ব্যক্তির যদি সদ্গুণ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তা হলে তার পক্ষে কখনোই সদ্গুণ অর্জন করা সম্ভব নয়। (আনোয়ারুল্লাহ, ২০০৩: ৯০) তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ন্যায় ও শুভ কী তা না জেনে কেউ ন্যায়বান ও কল্যাণনিষ্ঠ হতে পারে না। তাই তিনি দ্বান্দ্বিক ও আরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বাস্তব জীবনে বিভিন্ন ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করে যাচাই করেছেন। এই পদ্ধতিতে তিনি একটির পর একটি ধারাবাহিক প্রশ্ন করার মধ্যদিয়ে নৈতিক পদ, ধারণা ও নীতি সম্বন্ধে ঐক্যমত সৃষ্টি করে সার্বিক নীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। যার ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান। এ ক্ষেত্রে তিনি জ্ঞানের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার মানে জ্ঞান বা প্রজ্ঞাই মানুষের সদাচরণের ভিত্তি। তিনি বলেন, সত্যিকারের জ্ঞানী ব্যক্তি কখনোই অন্যায় করতে পারে না। সদগুণের জ্ঞানের অভাবেই মানুষ মন্দ কাজ করে। সকল অসদাচরণ, অন্যায়, পাপ অর্থাৎ সকল মন্দ কাজ অজ্ঞতা থেকে ঘটে। এজন্য সক্রেটিস 'মন্দ'কে অজ্ঞানতা বলে অভিহিত করেছেন। মানুষ কখনোই ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দ কাজ করে না, মন্দ কাজ করে অজ্ঞানতার কারণে। (আনোয়ারুল্লাহ, ২০০৩: ৯০) অর্থাৎ অজ্ঞানতা, মূর্খতা হলো অন্যায় আচরণের ভিত্তি। তৎকালীন সময়ে সোফিস্টরা নীতিবিদ্যাকে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জ্ঞানের অংশ মনে করে নৈতিকতার সার্বিক দিকটিকে অস্বীকার করেছিল। তাঁদের প্রভাবে সমাজে মানুষের মাঝে বিভিন্ন মতের প্রচলন ছিল। কুটতার্কিক হিসেবে খ্যাত সোফিস্ট সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা প্রচার করতেন, 'ব্যক্তি মানুষই সবকিছুর চূড়ান্ত বিচারক' (Man is the measure of all things.)। কিন্তু সক্রেটিস উত্তম, সত্য ও মঙ্গলের আত্মগত বা ব্যক্তিনিষ্ঠ মানদন্ডের বদলে প্রদান করতে চেয়েছিলেন এক সর্বজনীন নৈতিক আদর্শ। (শওকত, ২০১২: ১২৫-১২৬) তাই তিনি আরোহ ও দ্বান্দ্বিক কৌশল প্রয়োগ করে তাদের ব্যক্তিনিষ্ঠ ও আপেক্ষিক মতের অযৌক্তিকতা তুলে ধরেন এবং তা যে তাদের অজ্ঞানতার কারণে ঘটেছিল এ বিষয়টিও পরিষ্কার করেন। (Sidwick, 1967: 23-24) এতে করে তিনি সার্বিক জ্ঞান কী তা সুস্পষ্ট করে সার্বিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মনে করেন, স্বেচ্ছায় কেউ খারাপ কাজ করতে পারে না। সকল পাপ কাজ অজ্ঞানতা থেকে ঘটে। তাই অজ্ঞানতা দূর করে, জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানুষ নৈতিক জীবনযাপন করতে পারে।

সক্রেটিস তাঁর নীতিদর্শনে নিজেকে জানার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন, আত্মজ্ঞান অর্জন বা নিজেকে জানাই মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তাঁর মতে, আমরা শুধু জানি আমাদের কী করা উচিত, কিভাবে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা যায়। এ জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই মানুষের পরম কাম্য। (আমিনুল, ১৯৭৮: ৯৪) নৈতিক উপদেশ দিয়ে মানবজাতির নৈতিক উন্নতি সাধন করা যায় না। নিজের ভেতরে যা কিছু আছে তার সবটাই বুদ্ধি ও যুক্তির পরিস্কার আলোতে মেলে ধরাই হলো আত্মজ্ঞান। সক্রেটিস মনে করেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং মানুষকে তাদের নিজেদের মুখোমুখি হবার কাজে প্রবৃত্ত করার ভেতর দিয়েই আত্মজ্ঞান অর্জিত হতে পারে। (আজিজুল, ২০০২: ৪১)আত্মজ্ঞান থেকে মানুষ নিজের এবং অপরের জন্য ভালো কিছু করতে পারে। আত্মজ্ঞান থেকে একটি জাতি এবং রাষ্ট্র উপকৃত হতে পারে। সক্রেটিস মনে করেন, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নৈতিক ধারণাসমূহ ব্যক্তিবিশেষের বৌদ্ধিক চেতনার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আর মানুষ অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা লাভ করে আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে।

নৈতিক ধারণা সম্পর্কে জানা বা বুঝাটা হচ্ছে অনন্য একটা উপলব্ধি। এটা জ্ঞানের পূর্ণতা, আত্মার পরিপূর্ণতা। যেকোন বিষয় আতস্থ করার মধ্যদিয়েই এই পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব। এটিকে আরও ভালো করে তোলার অর্থ হলো নৈতিক গুণ অর্জন করা। যিনি এই পূর্ণতা অর্জন করেন তিনি শুধু সত্যানুসন্ধান ও সত্য উদঘাটন করে ক্ষান্ত হন না। তিনি সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে এর যথার্থ জ্ঞানলাভ করেন এবং তা তিনি বাস্তবজীবনে অনুশীলন করেন। সক্রেটিস মনে করেন, সম্পদ ও সম্মানের পরিবর্তে এথেনীয়দের উচিত তাদের আত্মাকে পুণ্যে নিখুঁত করার চেষ্টা করা। তিনি মনে করেন, জ্ঞানের অপূর্ণতা ও অকিঞ্চিৎকরতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মাধ্যমেই মানুষের পক্ষে জ্ঞানের নামে প্রচলিত যে কোনো অসার লৌকিক ধারণার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। (আমিনুল, ১৯৭৮: ৯৪) তাই সক্রেটিস মনে করেন, জ্ঞানের জন্য আত্মসমীক্ষা অপরিহার্য। কেননা জ্ঞান ব্যক্তিমানুষকে আত্মবিচারী করতে সাহায্য করে। সক্রেটিসের মতে, অপরিক্ষিত জীবনের কোনো মূল্য নেই। কেননা তিনি মনে করেন, যে ব্যক্তি নিজের জীবনের কর্তব্য,অকর্তব্য, উত্তম,অনুত্তমের আদর্শ খুজঁলো না, যে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সুন্দর কুৎসিত, শ্রেয়- এর ধারণা লাভ করতে পারলো না, তাঁর কোন মূল্য নেই। তিনি বুদ্ধি ও যুক্তির আলোর নিচে রেখে মানবজীবনকে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করার কথা বলেছেন। (আজিজুল, ২০০২: ৪১) তাই তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থের আগে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সন্ধান করেছেন এবং জ্ঞানকে নৈতিক কর্মের উপায় হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তার মতে, জ্ঞান যদি কর্মে রূপান্তরিত না হয় তাহলে তাকে জ্ঞান বলাই যাবে না এবং যদি কর্ম জ্ঞান ব্যতিরেকে হতে থাকে, তাহলে তা অকর্ম বা দুস্কর্ম। (আজিজুল, ২০০২: ২২) তিনি মনে করেন, নির্বিচার অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিমানুষ পাশবিক, কিন্তু আত্মবিচারী ব্যক্তিমানুষ নিয়মানুগ, সংযমী ও সুশৃঙ্খল জীবনভ্যাস রপ্ত করতে সক্ষম হয়। সক্রেটিস মনে করেন– স্বাধীন ও প্রাঞ্জল মানুষ কখনো নির্বিচারে কোনোকিছু মেনে নেয় না, মানুষ মাত্রেরই উচিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে এর ভিত্তি ও যৌক্তিকতা পরীক্ষা করে দেখা। এর জন্য প্রয়োজন এক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া। (আমিনুল, ১৯৭৮: ৯৪) এই প্রক্রিয়ায় জ্ঞানের অনুশীলন মানুষকে সংযমী, রুচিশীল ও পরিণতিতে মননশীল করে তুলতে সাহায্য করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, জ্ঞান মানুষকে প্রচলিত অযৌক্তিকতা থেকে, প্রচলিত প্রথাসিদ্ধ নিয়ম থেকে মুক্ত করে স্বাধীন বিচার-ক্ষমতার অধিকারী করে তুলতে সহায়তা করে। (আনোয়ারুল্লাহ, ২০০৩: ৯০) অর্থাৎ জ্ঞান মানুষকে সুশৃঙ্খল করে, আত্মবিচারী করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানুষ ভালো, কল্যাণ, ন্যায়পরতা, মিতাচার, ধার্মিকতা ইত্যাদি নৈতিক গুণ অর্জন করে। আর নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিমানুষ উত্তমজীবনের অধিকারী হয়। তাই সক্রেটিস উত্তমজীবন বলতে উত্তম নৈতিকজীবনকে নির্দেশ করেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ন্যায় ও সুনীতি পরিচালিত জীবনই হচ্ছে সক্রেটিসের উত্তমজীবন। চরিত্রনীতিকে তিনি জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাই দেখা যায়, তিনি তাঁর নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে জ্ঞানতত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আর সদগুণ সম্বন্ধে তিনি যে ধারণা পোষণ করতেন তা ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তাঁর মতে, সদগুণ হলো নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা। বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানুষ যৌক্তিক আচরণ করবে এটাই তাঁর জন্য যথার্থ। যেমন কোন রাষ্ট্রশাসকের ক্ষেত্রে 'শাসন' হচ্ছে অপরাপর কৌশলের ন্যায় একটি কৌশল। জুতা সেলাই একটি কৌশল বা শিল্প। তাকে শিক্ষা করে আয়ও করতে হয়। যে, সে কৌশল আয়ত্ত করতে পারে না। তেমনি যে রাষ্ট্রশাসনের শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যমে আয়ত্ত না করেছে সে রাষ্ট্রশাসনে অক্ষম। রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতা তাই সকলের নয়। কেবল যাঁরা শাসনে দক্ষ তাদের। (ফজলুল, ২০০২: ১৩)এই কর্ম-পদ্ধতিকেই সক্রেটিস প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন জীবনের ক্ষেত্রে। তাঁর মতে, প্রত্যেক মানুষই ভালো, ন্যায়, শুভ ও আত্মার উৎকর্ষের বাসনায় নিয়োজিত। এই নৈতিক গুণ মানবজীবনের পরম লক্ষ্য ও উপজীব্য। তাই উত্তমজীবনের জন্য শুভ ও সদগুণের স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের আগে জানা দরকার । শুভ কী, এবং এর উৎপত্তি কিসে- তা জানা প্রয়োজন। তাঁর ধারণা ছিল শুভ কী তা না জেনে মানুষ শুভকর্ম করতে পারে না। তেমনি ন্যায়পরতা কী তা না জেনে কেউ ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারে না, অর্থাৎ শুভ ও সুনীতির জ্ঞান ছাড়া শুভ ও সদগুণের অনুশীলন অসম্ভব। কোনো ব্যবহারিক কর্মের ক্ষেত্রে এ জ্ঞান যেমন– দক্ষ কারিগরকে অদক্ষ কারিগর থেকে পৃথক করে, ন্যায় ও সুনীতির ক্ষেত্রে তা সৎ লোক থেকে অসৎ লোককে পৃথক করতে পারে। যেমন 'সমতা', 'লিঙ্গ বৈষম্য' বলতে কী বুঝায়, সে বিষয়ে আমাদের জানতে হবে। তবেই আমরা সঠিক আচরণ করতে পারবো। সঠিক জ্ঞান থেকে অনিবার্যভাবে সঠিক আচরণের উদ্ভব ঘটে। (আমিনুল, ১৯৭৮: ৯৬) আর এ যুক্তিতেই সক্রেটিস বলেন জ্ঞানই সদগুণ।

কিন্তু আমাদের মাঝে এমনকিছু লোক আছে যারা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মন্দ কাজ করে। এটাকে দর্শনের ইতিহাসে 'সক্রেটিসীয় প্যারাডক্স' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ন্যায় ও শুভের ধারণা থাকা সত্ত্বেও কেন মানুষ অন্যায় ও অশুভ কাজ করে থাকে এটা সক্রেটিসের ধারণার বাইরে ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। (আমিনুল, ১৯৭৮: ৯৮)কারণ সক্রেটিসের ধারণা ছিল জ্ঞান থাকলে কেউ মন্দ কাজ করতে পারে না। মানুষ আত্ম-জ্ঞান দিয়ে প্ররোচিত হলে মন্দ কাজ করতে পারে না। জ্ঞানই সদগুণ এমনটি দাবি করে। সক্রেটিস বলেন যে, কেউ স্বেচ্ছায় মন্দ কাজ করতে পারে না এ জন্য যে, যিনি কাজটি করছেন তার যথার্থ আত্ম-জ্ঞান থাকলে কাজটি তিনি করতেন না। এখন কোন ব্যক্তি যদি সদ্‌গুণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করে তা হলে ধরে নিতে হবে ঐ ব্যক্তির সদ্‌গুণ সম্পর্কিত জ্ঞান পরিপূর্ণ জ্ঞানে রূপলাভ করেনি।(আনোয়ারুল্লাহ, ২০০৩: ৯০) এজন্য সক্রেটিস জ্ঞানের ক্ষেত্রে আত্ম-জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির বিষয়ে খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন।

তাহলে ওপরের আলোচনা থেকে এটা বলা যায় যে, আত্ম-জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে কোন্ ধরণের আচরণ করলে আমরা উত্তম জীবন যাপন করতে পারব তা জানা যায়। আর এটা না জানাটা হচ্ছে আমাদের অজ্ঞতা। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান থেকে ব্যক্তি এটা বুঝতে পারবে কোন্ ধরণের আচরণ মানুষের উত্তম জীবনের জন্য সহায়ক হবে। এখানে জ্ঞান কথাটিকে আমরা সচরাচর যে অর্থে বুঝে থাকি, সক্রেটিস একে সে অর্থে ব্যবহার করেননি। এর তাৎপর্য অনেক গভীরে। তাই সক্রেটিস যখন বলেন, জ্ঞানই সদ্‌গুণ স্বেচ্ছায় কেউ মন্দ কাজ করতে পারে না। অজ্ঞতাই অনৈতিকতার উৎস– তখন এ সব বাক্যকে সাধারণ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ না করে এগুলোকে ব্যাপক ও গভীর অর্থে বিবেচনা করতে বলেছেন। মানুষ তার আত্মার উৎকর্ষের কথা বিবেচনা করে আত্ম-জ্ঞান লাভ করে, ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করে। সর্বোপরি মানুষ নৈতিক গুণের অধিকারী হয়। আর সক্রেটিস মনে করেন, এটাই মানুষের ধর্ম। কাজেই আত্মার উৎকর্ষই হচ্ছে নৈতিক উৎকর্ষ। তাই বলা যায়, জ্ঞান মানেই যেহেতু

সত্য জ্ঞান বা সত্য এবং যথার্থ জ্ঞান থেকেই যেহেতু পুণ্য উৎসারিত সেহেতু জ্ঞান ও সত্যের সাথে পুণ্য, ভালো বা মঙ্গলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আর এটাই তাঁর নীতিতত্ত্ব তথা উত্তম জীবনের সারকথা। (শওকত, ২০১২: ১২৪) সক্রেটিস স্পষ্ট কোনো মতবাদ দেননি। এজন্য দর্শনের আলোচনায় তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবু তাঁর প্রায়োগিক দর্শনের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। খাঁটি বিশুদ্ধ অর্থে তিনি দার্শনিক ছিলেন কারণ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা জেনেই তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী। সক্রেটিস ছিলেন একজন মহামানব। তাঁর নীতিদর্শন ছিল মানবিক চেতনায় শক্তিমান। তিনি মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ একটি দিককে আলোচনার জন্য বেছে নেন। সক্রেটিস, সফিস্টদের নৈতিক আপেক্ষিকতার সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে নৈতিকতার এক সর্বজনীন মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চেয়েছিলেন, সাধারণ মানুষ জানতে পারুক রাষ্ট্রের কাছে তাদের কী কী অধিকার আছে, সমাজ তাদের কী দিতে পারে, তাদের উত্তম জীবনের বাস্তবকাঠামো কী হতে পারে ইত্যাদি। এই সত্যানুসন্ধানে তিনি সমগ্রজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এমনকি এথেন্সের যুবকদের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানদান করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে স্বহস্তে হেমলক বিষ পান করে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। সক্রেটিসের নীতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে উত্তম জীবনের যে দিক-নির্দেশনা আমরা পাই তার গুরুত্বসমূহকে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে: সক্রেটিসই পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে আদর্শ জীবন সম্পর্কিত আলোচনা বা উত্তম জীবনের দিক-নির্দেশনা প্রদানকে দার্শনিক গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছিলেন। এর পূর্বে পিথাগোরাস প্রমুখ দার্শনিক নৈতিক আলোচনা তথা উত্তম জীবন নিয়ে অনেক কিছু বললেও পিথাগোরীয়ান নীতিশিক্ষা দার্শনিক তত্ত্বের আকারে সুগঠিত ছিল না। তিনি বরং এক ধরনের সাধনা করতেন এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে একটি নতুন জীবনব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন যাকে কোনো সুফী তরীকা, সাধন পদ্ধতি তথা ধর্মপ্রচারক পর্যায়ের বিষয় বলা যেতে পারে। কিন্তু সক্রেটিসের এ সংক্রান্ত প্রয়াস পুরোমাত্রায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির আদলে নিবেদিত। আর এভাবেই তিনি উত্তম জীবনের দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করেন। সক্রেটিসের সমসাময়িক গ্রিক দর্শনে সোফিস্ট নামক যে দার্শনিক সম্প্রদায় প্রভাব বিস্তার করেছিল তারাও নীতিবিদ্যার চর্চা করেছেন। মানবাচরণের ভালো-মন্দ, নীতি, আদর্শ ও নৈতিকতা সর্বোপরি উত্তম জীবনের নীতিনির্ধারণ করার বিষয়টি সোফিস্টদের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। তবে 'সোফিস্ট' শব্দের অর্থ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান বা দার্শনিক মননের ধারক ব্যক্তি হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য যতটা না জ্ঞানচর্চা তার চাইতে ছিল ব্যবসায়িক। দার্শনিকগণ যে রকম জ্ঞানের জন্য জ্ঞানচর্চা অথবা কল্যাণকর আদর্শ জীবনের জন্য জ্ঞানচর্চা করেন তৎকালীন সোফিস্টদের সেসব বৈশিষ্ট্যের ঘাটতি ছিল; বরং জ্ঞানচর্চার মধ্যে দিয়ে অর্থ উপার্জন তাদের অনেকটা মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে গিয়েছিল। আর এ কারণেই জ্ঞান, সত্য, সুন্দর, আদর্শ, ন্যায়-নীতি ও উত্তম জীবন এগুলো কোনো কিছুতেই তাদের কোনো স্থায়ী সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা ছিল না কোনো সর্বজনীন মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার পক্ষে তারা ছিলেন না; বরং যার স্বার্থে যেটা ভালো সেটাই তার জন্য ভালো এ ধরনের আত্মস্বার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে তারা অনুমোদন দিয়ে গিয়েছেন। এতে করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পথই সুগম হয়। এই অবস্থা থেকে প্রজ্ঞা নির্ভর কোনো সুনীতিকে আদর্শ জীবনের জন্য বা উত্তম জীবনের জন্য সর্বজনীনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার যৌক্তিক প্রয়াস গ্রহণ করার কারণে নীতিবিদ্যার ইতিহাসে সক্রেটিস অত্যন্ত প্রশংসনীয় স্থান দখল করে আছেন।

তথ্যনির্দেশিকা:

ইসলাম, আমিনুল (১৯৭৮), *পাশ্চাত্য দর্শন: প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, ঢাকা: মাওলানা ব্রাদার্স।

করিম, সরদার ফজলুল (২০০২), *প্লেটোর সংলাপ*, ষষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা: প্যাপিরাস প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান।

ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ (২০০৩), *নীতিবিদ্যা*, ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা।

শাহনাওয়াজ, এ. কে.এম. (১৯৯৬) *বিশ্বসভ্যতা: প্রাচীন যুগ*, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা।

হক, হাসান আজিজুল (২০০২), *সক্রেটিস*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা সংস্থা।

হোসেন, মো. শওকত (২০১২), *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শনের কথা*, ঢাকা: তিথি পাবলিকেশন।

Guthrie, W.K.C. (1969), *A History of Greek Philosophy*, Vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press.

Jowett, B., *Dialogues of Plato*, অনুবাদ: করিম, সরদার ফজলুল (১৯৬৪) *প্লেটোর সংলাপ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

Lindsay, A. D. (1954), ed., *Socratic Discourses*, London: Dent and Sons Ltd.

MacIntyre A. (1966), *A Short History of Ethics*, London: Routledge and Kegan.

Stace, W.T. (1965), *A Critical History of Greek Philosophy*, NewYork: St. Martin's Press.

Sidwick, H. (1967), *Outline of the History of Ethics*, NewYork: St. Martin's Press.

[Abstract: Ethical discussion is one of the most important aspects of human science. This is a discussion of axiology, an important branch of philosophy. It is to be maintained that the ultimate purpose of every ethical study is to attain the perfect code of our conduct that can make life good. From the very beginning of Eastern philosophy, moral studies have been getting more priority than any other fundamental issues of philosophy. On the other hand, the main attainment of Western philosophy was not about moral aspects. In the time of Socrates, the golden age of Greek civilization, moral studies or philosophy for a good life gets notable attention. For that reason, Socrates is to be considered the first protagonist of Western Ethics. This paper aims to state, analyze and evaluate the theoretical work of Socrates regarding a good life. It also critically examines the relevancy of his moral prescription in our individual and social lives. The methods of this research are descriptive, analytic and in some way inductive.]